আঁধার মহিষ সমাজ চেতনার ফসল

অমিত মণ্ডল

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সাহিত্য - সংস্কৃতি ও শিল্প সৃষ্টিতে, সমাজ দর্শনে যে ক্ষয় আর বিকারের সংক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, খাঁটি জীবানুধ্যান আশ্রিত রচনার প্রবাহ যখন ক্ষীণতোয়া, আধুনিকতাবাদের অন্তর্ঘাত যখন জীবনের মূল্যবোধকে পঙ্গু করার জন্য প্রতিনিয়ত উপঢৌকন সাজাচ্ছে, ইউরোকেন্দ্রিক আধুনিকতার শৃঙ্খলে শিল্পভাবনা যখন দেশীয় ঐতিহ্য আর লোকায়ত দর্শন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং মেদ সর্বস্বশিল্প বেসাতির চাকচিক্য যখন ক্রমবর্ধিষ্ণু --- সেই অবস্থানে অভিজিৎ সেন সম্পূর্ণ বিপরীত মের লেখক। তিনি রক্তের উষ্ণতা দিয়ে জীবন রাঙান, তিনি জীবন পুড়িয়ে সত্যের সুষমা আবিষ্কার করেন, তাঁর কলম বিস্তীর্ণ মানবজীবনকে শিল্পে উত্তীর্ণ করে। পাশাপাশি এটাও মান্য, লেখকের যাপিত সময়ে অভিজ্ঞতার চাপ তাঁর সৃজন মুখরতার অন্তরঙ্গ সুজন, সময়ের গভীরের অজস্র টানাপোড়েন লেখককেজাগিয়ে রাখে নিরন্তর আর একজন সৎ লেখকের সৃষ্টকর্মে তার প্রতিফলন, তা যে যত খণ্ডিতই হোক না কেন, পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। অভিজিৎ সেন সেই ধারারই একজন লেখক যাঁর অভিজ্ঞতা জীবনবোধ আর শিল্পজ্ঞান মিলে মিশে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয় আর মননঋদ্ধ পাঠক পণ্য সাহিত্যের ভিড়ের মধ্যে মুক্তির আনন্দে ডানা ঝাপটানোর রসদ খুঁজে পান।

একজন লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই লেখেন। তাঁর জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা সব কিছুই লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে। কিন্তু তখন কলমকে হয়ে উঠতে হয় লেখকের মনোজগতের শৃঙ্খলার বিশ্বস্ত হাতিয়ার। সেই বিশ্বাসকে হতে হবে আত্মিক, আরোপিত নয়। এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে মান্যতা দিতেই হবে। অন্ততঃ ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে। কারণ ঔপন্যাসিকতাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষ ও সমাজকে নিরীক্ষণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, 'পদ্মা নদীর মাঝি লেখার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝিদের কাছে এসেছিলেন, তাদের জীবনযাত্রা আন্তরিক ভাবে স্পর্শ করেছিলেন। সমরেশ বসুও 'টানাপোড়েন' লেখার আগে বিষ্ণুপুরের তাঁতিদের জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ পরিচয় নেবার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানকার তাঁতিদের সঙ্গে মিশেছিলেন কিন্তুএই অভিজ্ঞতাকে হতে হবে সুদূরপ্রসারী, তাৎক্ষণিক নয়। কারণ তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতায় আন্তরিকতার স্পর্শ থাকলেও সমাজবাস্তবতার গোটা রূপটা ধরা পড়ে না।

অভিজিৎ সেন সেই শ্রেণীরই লেখক যাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত ।একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন 'আমার সাহিত্যিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে --- গ্রাম, নগর এবং মহানগর এই তিন অবস্থানেই আমার অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপক। আমার জন্মও শৈশব কেটেছে পূর্ববাংলার এক গ্রামে। কৈশোর এবং যৌবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে কলকাতার মত মহানগরীতে। পরবর্তী জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে উত্তরবাংলার ছোট শহর ও গ্রামে। আমি পশ্চিমবাংলার জেলাগুলোর বেশ কয়েকটি শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসও করেছি। এইসব জায়গার সমাজ সংস্কৃতি, উন্নয়ন, প্রশাসন এবং রাজনীতির মধ্যে নানা ভূমিকায় জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য আমার দুই -ই ব্যাপক ভাবে হয়েছে...'

এই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই অভিজিৎ সেনের উপন্যাস 'আঁধার মহিষ' যা তাঁর প্রখর সমাজ সচেতনতার ফসল। অনেকখানি আঁধারের মধ্যে আমাদের খুব চেনা সমাজের রূপকল্পে ভাঙচুর করেন অভিজিৎ সেন। হিন্দু ও মুসলমানের আচার সর্বস্ব জীবনযাপন ও সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতার বাস্তব ছবিটি তুলে ধরেন, অনেকের আজন্মলালিত ধারণা ও বিশ্বাসের

ভিত্তিভূমিটি নাড়িয়ে দেন। অন্য একটি স্তর গড়ে দেন। ধর্মের নিহিত সত্যটির ব্যাখ্যা সচেতনভাবে বিস্মৃত হয়ে রক্তে গভীরে যারা জাগিয়ে তোলে হানাহানি তাদের বিদ্ধে প্রতিস্পর্ধী প্রতিরোধের অগ্নিশিখাটি জ্বালিয়ে দিতে ভুল করেন না অভিজিৎ সেন। এখানেই হয়ে ওঠে লেখকের নিজস্ব প্রতিরোধ। কামাল - অলকানন্দা - সুভদ্র - সুরঞ্জনা - রফিকুল - আমাদ হোসেন প্রমুখ চরিত্র গঠনের আড়ালে লেখক সমাজবাস্তবতার দিকটি এমনভাবে চিহ্নিত করেছেন যেখানে তার ঐতিহাসিক সততা টি গুত্ব পায় আর লেখক নিজে যুত্ত সঞ্চিত অন্ধকারেকে অস্বীকার করে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ান।

উপন্যাসের মূল চরিত্র কামাল। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। সমস্ত রকম ধর্মীয় গোঁড়ামির বিদ্ধে তার জেহাদ। সে অলক ানন্দাকে বিয়ে করে। উত্তরবঙ্গ কলেজে পড়াশোনার সময় তারা পরস্পরকে হৃদয় দিয়ে ফেলেছিল। বিয়ের আগে কিংবা পরে অলকানন্দা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়নি। অলকানন্দার মা ধর্মীয় আচার আচরণের মাত্রায় আর তার বাবা তীব্র মুসলমান বিদ্বেষে বিষয়টিকে দেখেছিল। তাই সে ঘরছাড়া। কামাল যুত্তিনিষ্ঠ ও উদারমনস্ক। সে দৃঢ়ভাবে জানায়
'মুসলমমানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যত্তিগত জীবন যে ভীষণভাবে এবং অপরিবর্তনীয় ভাবে কোরানও হা দিস নির্ধারিত এই বিপজ্জনক মতবাদে সে আস্থাশীল নয়। বলেছিল, কোরানও অপরিবর্তনীয় নয়। কোরান বিবর্তিত হয়েছে । তেইশ বছর ধরে পুরোনো নির্দেশ অপ্রয়োজনীয়বোধে নতুন নির্দেশ দ্বারা সংশোধিত হয়েছে। যে সংশোধনের প্রত্রিয়া কো রান আবিষ্কারের তেইশ বছর পর্যন্ত চালু ছিল, তা তার পরবর্তী তেরোশো বছরে অপরিবর্তনীয় থাকে কি করে? ইসলামী আইনবিদরা অনেক সময় পরস্পর বিরোধী বিধান দিয়েছেন এবং মজার ব্যাপার সব পক্ষই নিজ নিজ বিধ ানের সমর্থনে এ কই আয়াৎ উপস্থিত করেছেন।'

কামালের এই বত্তব্যে পীরগঞ্জের স্কুলের সেত্রেটারি উচচশিক্ষিত আমজাদ হোসেন যাঁর ধারণা ছিল কামাল আধুনিক শিক্ষায় আধুনিক হলেও যথার্থ মুসলমান সে; কামালকে যেভাবে তিনি এতদিন দেখেছেন বা গ্রহণ করেছেন এখন তার এই পরিবর্তনে তিনিআহত হন। তাই কামালকে 'তুমি কি সত্যিই কোরান হাদিসের নির্দেশ মান না!' এই প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেন না আর অনেকদিন লড়অই করে শেষ পর্যন্ত পীরগঞ্জের মতো এক গণ্ডগ্রামে এসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো কামাল বিনীত ভাবে জানিয়েছিল---- 'মানেন না আপনিও। সেভাবে বিচার করলে কোনো মুসলমানই মানে না। আপনি যে হার্ট - ট্রাবলের জন্য বুকে পেস মেকার বসিয়েছেন, তার কোনো বিধান কি হাদিস - নির্দেশিত চিকিৎসা বিধিতে আছে? আসলে মানা যে আর সম্ভব নয়, এটাই আমরা সবাই মানতে পারছি না। মানা, না মানার জন্য বাস্তব দৃঢ়ভূমি দরকার।' কামালের উত্তরে উচচশিক্ষিত মূলত সৎ এবং বিবেকী মানুষ আমজাদ হোসেনের পায়ে নিচের জমি যেন সরে যায়। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ শু হয়। তাই আমজাদ হোসেনকেও বলতে হয়--- 'বহুবিবাহ, তালাক, মুসলিম ব্যত্তিগত আইন, মোল্লাদের ফতোয়া ইত্যদির শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহার মুসলমান ধর্মকে কলুষিত করছে। ইসলামে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের স্থান নেই।'
কামাল যেন পিছিয়ে যেতে পারে না। বাপ - মা, স্বজন, নিজের সমাজ জন্মস্থান, নিজের পরিচিত পরিমণ্ডল সবকিছুই তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে আসতে হয়েছে। নিজের স্ত্রী অলকানন্দাকে নিয়ে সামান্য আশ্রয়ের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়েছে ---- তবুও কামাল হার স্বীকার করেনি। তাই তার কণ্ঠস্বরও তপ্ত হয়। সেই নির্দ্বিধায় অমোঘ সত্যটি বলতে পারে-- - 'পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মইপরধর্ম বিদ্বেষী। কোনো ধর্মই নিরপেক্ষ এবং সহনশীল নয়। একটি পৃথক ধর্মের অর্থই হল উপস্থিত অন্য ধর্মগুলোর সঙ্গে বিরোধ করা।প্রত্যেক ধর্মই নিজের নিয়মগুলোকে অজর অমর করে রাখতে চায়। ধর্ম যেহেতু দর্শন নয়, এ নিয়ে বিতর্ক চলে না, যা চলে, তা হল হানাহানি, হত্যা, ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগ।'
সমস্ত রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ইসলাম বিরোধী দাম্পত্যজীবন মেনে নিতে সে কোনো মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, কোনো পাপবোধ জাগে না। কারণ কামালের মনে হয় সে কেবল একটা প্রচলিত নিয়ম ভেঙেছে। একটা গোঁড়ামির বিদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তার মনে হয় যে সে অর্থে মুসলমান নয়, তার স্ত্রী অলকানন্দা সেই অর্থে হিন্দু নয়, তারা কেবল দুই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আর তাই তাঁরা হিন্দুরও শত্রু, মুসলমানেরও শত্রু। কামাল আমজাদ হোসেনকে বলে-- -- 'হিন্দু কিংবা মুসলমান কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই শুধু মানুষের আচরণ বা জীবনযাত্রার বিধি তৈরী করেনি। ম ানুষের শুভবুদ্ধি, যুত্তি ও প্রাকৃতিক নিয়ম যুগ যুগ ধরে, বিশেষ করে গত তিন - চারশো বছর ধরে নতুন এক বিধান তৈরী

করেছে। জিওদার্নো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গ্যালিলিওকে বন্দী করে রেখে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সত্যকে তাঁকে দিয়ে অস্বীকার করানো হয়েছিল। কিন্তু এতসব করেও তাঁদের দর্শন কিংবা বিজ্ঞানলব্ধ সত্যকে দমিয়ে রাখা যায়নি, মিথ্যা প্রমাণ করতে পারা যায়নি'। তাই তেরেশো বছরের আগের বিধিবিধান নিয়ে সে অনড় থাকতে চায় না।

কিন্তু আমজাদ হোসেন কামাল - অলকানন্দার স্বামী - স্ত্রীর বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত হয়। মহরমের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কায় সে কামালকে সুভদ্রর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেয় আর অলকানন্দা তার বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে। এ পরামর্শে কামাল বিষণ্ণ হয়। সে আপস করবে বিদ্বেষী সমাজের সঙ্গে! নিজের সঙ্গে লড়াই শু হয়। কামালের অলকানন্দার মথা মনে পড়ে। একদিন অলকানন্দা বলেছিল---- 'এই করতে করতে একসময় হয় তোমাকে হিন্দু হতে হবে, না হয় আমাকে মুসলমান হতে হবে।'

কামাল ভারতীয় মুসলমানের অসহ্য একাকীত্ব অনুভব করে। তার মনে হয় অভিশপ্ত এই অস্তিত্ব, অভিশপ্ত এই জীবন, এমনকি মৃত্যুও অসম্মানপূর্ণ। অলকানন্দা কিন্তু আলোর সন্ধান দেয় কারণ সে জানে এই সমাজের মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে বন্ধু স্বজন।

কামালের দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতি সুভদ্রর স্ত্রী সুরঞ্জনার সন্তান সম্ভাবনার খবর শুনে কামাল ইল্লসিত হয়। কারণ সে বাচছা ভালোবাসে। সে নিজেই বলে 'যে বাড়িতে বাচছা নেই, তার মতো নিরানন্দ বাড়ি নেই।' কামালের দাউদ হায়দারের কবিতা মনে পড়ে----'ইদানিং ইউরোপে গর্ভবতী নারী দুর্লভ, মনে হয়/ গোটা দেশ জাতি/ নির্বীজ, নুপংসক। নারী প্রগতির নামে যথেচছ/ নগ্নতা, লেসবিয়ান/ যৌনচার। সারাদিন কি ভাবো, নির্বাসিত/ জীবনের কথা, নাকি / একাকীত্বের জীবন? এই কবিতার অনুষঙ্গে কামাল তার ও অলকানন্দার জীবনের সাযুজ্য খুঁজে পায় যেন। নিঃসঙ্গতার একাকীত্বের সাযুজ্য। অলকানন্দাকে জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য দেশ ও সমাজের কাছ থেকে অসম্মান ও লাঞ্ছনার গ্লানি এবং সেসবকে নিরন্তর সয়ে যাওয়ার মধ্যে কামালের ভেতর তৈরী হয় বিপুল হতাশা। সে নিজেও নিজের সন্তান চায়। কিন্তু বিপুল হতাশা তাকে জীবনবিমুখ করে তোলে। সে ভয় পায়। তার অনাগত সন্তানের আইডেন্টিটির বিষয়টি ভেবে সে কুঁকড়ে যায়। সে অলকানন্দাকে বলে, 'কি নাম হবে বলতো আমাদের সন্তানের? কার পরিচয়ে পরিচয় দেবে সে ?কি পদবী ছাড়াই নাম লিখবে? সব দরখাস্তের ফর্মেই তো ধর্মের জন্য আলাদা একটা ফাঁকা জায়গা থাকে? আমি কি করব ? কি লেখাব আমরা ? যদি মুসলমান লেখে তুমি কি খুশি হবে? যদি হিন্দু লেখে--- আমি? তুমি কি আকিকা, ছুন্নৎ, বিসমিল্লাখান ইত্যাদি মুসলমানি আচার - আচরণ করবে? আমি কি করব অনুরূপ হিন্দু আচরণগুলো ? এবং এ সবের পর ? যদি তোমার মতো আমার মতো মানুষ তার না জোটে, তাহলে কি এই আচার সর্বস্ব মূলস্রোতের যে কোন একটায় ঢুকে যাবে? ঢুকে গিয়ে নির্বিবাদে সাম্প্রদায়িক স্রোতে গা ভাসিয়ে নিয়ে জ্বলবে এবং প্রতিপক্ষকে জ্বালাবে? না কি সে একটা উদ্বায়ী কিম্ভূত মানুষ হবে, অলকানন্দা ?'

কামালের এই ভাবনা বাস্তব। বর্তমান সমাজ কাঠামোয় এটাই সত্য। পদবীহীন একটি সন্তানের জীবন যন্ত্রণা কি মর্মান্তিক, কি ভয়াবহ হতে পারে তা লেখক হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজমনস্ক অভিজিৎ সেন কামালের বক্তব্যের মধ্যে শোষণের একটা প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আমাদের সামনে এনেছেন যে শোষণের বাহ্যিক প্রকাশ নেই কিন্তু ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়। সমাজের স্থিতিশীলতাকে ঠিক রাখার জন্য এই জাতীয় শোষণ যেন কত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে!

অলকানন্দা যে স্বপ্ন দেখে। অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন। সে কামালকে বলে 'আমাদের একটি সন্তান চাই, কামাল। আমাদের সন্তান --- সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়--- সে হবে শুধু মানুষ। যে নামে তাকে ডাকব আমরা আদর করে, তাই হবে তার নাম। ইস্কুল ভর্তির দরখাস্তে পদবীর জায়গায় কিছু বসাব না আমরা, ধর্মের জায়গায় শূন্য রাখব। যদি এর জন্য আমাদের সব জায়গায় লড়াই করতে হয়, সব জায়গাতেই লড়াই করব। আমাদের সন্তান তার সঙ্গী খুঁজবে এই দেশের অসংখ্য মানুষের মধ্যে। কামাল, আমি এদেশের মেয়েদের মতোই গর্ভবতী হতে চাই, সন্তান চাই, শুধুমাত্র কামনা সর্বস্ব রতিক্রিয়া চাই না, লেসবিয়ান প্রেম চাই না। কামাল, যে ঘরে একটিও শিশু নেই সে ঘর কী ভয়ংকর'!

অলকানন্দার এই স্বপ্ন এই পরিকাঠামোয় কতটা বাস্তবায়িত হতে পারে --- সে প্রশ্ন থেকেই যায়। পাশাপাশি এই স্বপ্ন সফল করতে সে লড়াইটাও জারি রাখতে চায়। অলকানন্দা জানে পীরগঞ্জের মাটি তাদের পক্ষে নিরাপদ নয় তবু সে ভয় পায় না। সে কামালকে সাহস জোগায়। পীরগঞ্জের জমিতেই সে নুতন করে বীজ বুনবে, ডালপালা বিস্তার করবে এই আকাশেই।

সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিদ্ধে তারা লড়াই করবে নিজেরাই, কারো পাখার আড়ালে নয়। লেখক অভিজিৎ সেন কামাল ও অলকানন্দার মধ্যে দিয়ে যে শক্তির ইঙ্গিত দেন তা কোনো ব্যক্তির নয়, কেবল গোষ্ঠীর নয়, বরং তা হলো মানুষের শক্তি। উপন্যাসে বিধৃত দাঙ্গার অনুপুঙ্ক্ষ ছবি লেখকের অভিজ্ঞতারই ফসল। দাঙ্গায় কামালও অলকানন্দা দুজনেই আহত। সুভদ্রকে হাসপাতালে যেতে হয়। অলকানন্দার মা'কে দেখার দায়িত্ব সুরঞ্জনার ওপর অর্পণ করে সুভদ্র বেরিয়ে যায় হ াসপাতালের উদ্দেশ্যে।সুরঞ্জনার কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় অলকানন্দার মা'কে সে কি বলবে। উপন্যাস এখানেই শেষ হয়।
দাঙ্গার ইতিহাস বহু বছরের পুরোনো এবং এখনও তা বর্তমান।। হিন্দু - মুসলমান, হিন্দু - শিখ, মুসলমান - বৌদ্ধ, শিয়া - শুন্নী এবং একইসঙ্গে হিন্দু - বৌদ্ধ - জৈন-খ্রীস্টান প্রমুখ ধর্মের নামে দাঙ্গা আজও সমাজে বহমান। অথচ দাঙ্গার সময় এক ধরনের কথা খুব উচচারিত হয় তা হল ---- 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যুগ যুগ চলছে, এবারই তা লঙিঘত হল।' এ উচচ ারণে বক্তাদের শুভবুদ্ধি বা শুভাকাঙক্ষা হয়তো প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হয়ে ওঠে না। অবশ্য এর উল্টোটাই যে সত্যি তাও নয়---- সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি সবসময়ে ঘটে চলেছে তাও তো নয়। সব সময় ঘটে না, সব জায়গায় ঘটে না। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সহাবস্থানের এবং অসাম্প্রদায়িক উজ্জীবনের অজস্র উদাহরণ আছে ইতিহাসে। এক এক স্থানে এক এক সময়ে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনি আবার সৌহার্দ্যের কথাও শোনা যায় অবিরল। কিন্তু বলবার কথা হয়তো এটুকুই যে, এতদিনেও প্রতিবেশী দুই সম্প্রদায়ের নিহিত বিচ্ছিন্নতাকে দূর করা গেল না। আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসতাম ব্রিটিশরা নিজেদের শাসন দৃঢ় করার জন্য একটি হাতিয়ার এই ভূখণ্ডের দুই বৃহৎ ধর্মীয় সা ম্প্রদায়িকতা। মানতে দ্বিধা নেই ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে এই ভূখণ্ডের দুই বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলম ানের মধ্যে বিভেদ অবশ্যই ছিল। কিন্তু তা সাম্প্রদায়িক হানাহানির স্তরে কখনই পৌঁছায়নি। ধর্মের জিগির তুলে দুই স ম্প্রদায়েকে লড়াইয়ের ময়দানে নামায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তাই আশা ছিল ভেদনীতির জনক ইংরেজ শাসন অপসৃত হলে দুই সম্প্রদায় পারস্পরিক সৌহার্দ্যের দৃঢ় জমি প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সে আশা মরীচিকায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরেও তা অব্যাহত আছে। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংবিধানে স্থান পেলেও ভারতীয় সংবিধানের চরিত্র গোড়া থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ ছিল যার অর্থ সর্বধর্মে সমভাব। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে প্রশাসনযন্ত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই সঞ্চালিত হচ্ছে। তবু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও দাঙ্গার মাথা তোলা বন্ধ হয়নি। এটাই বাস্তব। ধর্ম নামক দাঙ্গা ছাড়াও সমাজের অগ্রসর -অনগ্রসর অধিবাসীর দাঙ্গা এবং ভাষার নামে দাঙ্গা সংগঠিত হয়ে চলেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল সময়কে গ্রাস করে অপ্রতিরোধ্য এই সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মীয় মৌলবাদ ব্যক্তিবুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেয়, নষ্ট করে, পচিয়ে দেয়। আর, তাই সবার অলক্ষ্যে দেশের ভিতরে, নিজের ভিতরে তৈরী হয়ে যায় সমান্তরাল আর একটি দেশ, এক নীরব বিচ্ছিন্নতা। আর তাই ৬ই ডিসেম্বর ও তার পরের ঘটনাবলীর প্রতিত্রিয়ায় একরাম আলিকে লিখতে হয়--- 'সংখ্যালঘু হিসেবে বা মুসলম ান হিসেবে নয়--- মানুষ হিসেবে আমিযদি কিছু লিখতে চাই, সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বায়বীয় স্তরটির সপ্রশংস সায় হয়তো থাকবে, কিন্তু সাধারণ পাঠক সমাজে আমার পরিচয় কি হবে না যে আমি একজন 'মুসলমান লেখক'? তাঁর জেহ াদটিও প্রশংসনীয় --- ' 'সংখ্যালঘু লেখক, মুসলমান লেখক হিসেবেএকটা লাইন আমি লিখতে চাই না। এইভাবে, হীন পদ্ধতিতে বিনোদনের উপাদান হবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। মুসলমান লেখক, মুসলমান বুদ্ধিজীবী আমি হাজার প্ররোচনাতেও হতে চাই না। কেননা, আর পাঁচজন মানুষের মতই বন্দিত্ব অপেক্ষা স্বাধীনতা আমিবেশী পছন্দ করি'। বলতে দ্বিধা নেই সমাজের বুকে মানসিক বিচ্ছেদের যে বিস্তার ছড়ানো আছে আমাদের প্রতিফলনও এখানে প্রাসঙ্গিক --- 'আমর া বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফসল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি।অ ামরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।'
যে ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে, যে ধর্ম বৃহত্তর মিলনের মধ্যে কাঁটাতারের বিভাজন নির্মাণ করে--- সেই ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো--- এটাই তো ছিল রবীন্দ্রনাথের আহ্বান। তবু আমরা ভুলে যাই সেই কবে আমাদের নজল লিখেছিলেন 'কাণ্ড ারী, বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার'। কে শুনবে সে কথা? আমাদের কাছে একটাই প্রশ্ন--- হিন্দু, না ওরা মুসলিম।

এই পরিচয়ের মধ্যেই আটকে যায় মানবধর্ম। তাই শ্রী হর্ষ মান্দারকে (যিনি গুজরাট - গোধরার গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী পদত্যাগী সিভিল সার্জেন্ট, সরকারী প্রাতিষ্ঠানিক নিষ্ক্রিয়তার বিদ্ধে জেহাদে পদত্যাগ করে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বলতে হয় 'সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছেড়ে আমাদের সকলকেই সামিল হবে হবে দুর্বার দুর্জয় প্রতিরোধে। মনুষ্যত্ব ও মানবধর্মের পতাকাটিকে সবার উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই কাজ আমাদের অবশ্য করণীয়।' তা না হলে সন্তান হারা মায়ের চোখের কোণ দিয়ে দু'গাল বেয়ে যা নেমে আসে সে জল বা পাণি যাই হোক্‌তা যে নোনতাই হয়, সে মা হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক্‌ না কেন্‌, সে যে মাই-ই---- এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলব। প্রতিবেশীকে যদি আমরা শুধু প্রতিবেশী বলেই চিনি, তাহলে আমরা কি খুব খারাপ থাকব। তার আগে তো ইতিহাসে সেই তমসাচ্ছন্ন দিনগুলোর পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে মানবতাবাদী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তুলতে হবে। কামাল অলকানন্দাদের ক্ষীণ আগুনের তীক্ষ্ণ শলাকে ভেঙেফেলে আগুনের মহান পরিধিকে কণ্ঠে নিয়ে গর্জে উঠতে হবে, ফুঁসে উঠতে হবে কার্ল - মার্কস- এর সেই অমর ভাষ্যে ---' যা কিছু মানবিক, তা-ই আমার আত্মীয়।'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com